কালের কণ্ঠ
09 FEB 2015

কে এম শাহনাওয়াজ

আমাদের শিক্ষার ধারা ও একুশের চেতনা

যে বাংলা ভাষার মূল শক্ত মাটিতে প্রোথিত, অশুভ ঝোড়ো বাতাসে তার উৎপাটন সম্ভব নয়। বড়জোর ডালপালা ভাঙতে পারে। সচেতন বাঙালির সতর্ক পরিচর্যার জল সিঞ্চনে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াবে ভাষার গাছ। সংস্কৃতির ডালপালা গজাবে নতুন তেজে। অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী হবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম'। বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি ঈর্ষণীয় জায়গায় এসে পৌঁছাতে পারে

একটি জাতির সংস্কৃতি তার ভাষার বাহনে চড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা হারিয়ে ফেললে প্রজন্ম সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফলে যেকোনো অশুভ শক্তি আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করতে পারবে সহজেই। পাকিস্তানি শাসকচক্র এ সত্য ১৯৪৭ সালেই বুঝেছিল। তাই বাংলা ভাষার ওপরই প্রথম আঘাত হানে। আমাদের পূর্বসূরিরা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে আত্মপরিচয়কে সমুন্নত রাখতে পেরেছিল। কিন্তু চৈতন্য-বিচ্ছিন্ন আমরা নানাভাবে একে লালন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। এক ধরনের উগ্র আধুনিকতা ও অপূর্ণ বৈশ্বিক ভাবনা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতির বিকৃত ধারণা থেকে আমরা বাঙালি সংস্কৃতির বিকলাঙ্গ অবয়ব উপস্থাপন করছি।

একুশে আমাদের জাতীয় অহংকার হলেও একুশের মূল চেতনা থেকে আমরা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছি শুধু সংস্কৃতিবোধ ও ইতিহাস চেতনা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে। ভাষা আন্দোলনের পর বাষট্টি বছর পেরিয়ে গেলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যতটুকু বিকাশ ঘটার কথা ছিল তার অনেকটাই হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপূর্ণ স্বাজাত্যবোধের কারণে ভূতের পায়ে হেঁটে পিছিয়েও গেছে। এমন কথাও চলে আসছে যে বিশ্বায়নের যুগে বাংলা ভাষা চর্চা অত জরুরি কেন? এখন বিশ্ব-সংস্কৃতির জোয়ারে গা ভাসাব—বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে পড়ে থাকা কেন? ফলে একই দেশে স্কুলপর্যায়ে তিন-চার ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা অসম প্রতিযোগিতায় এগোচ্ছে। এই জগাখিচুড়ির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি। স্পষ্টতই স্কুলপর্যায়ে চারটি শিক্ষা-ধারা এখন প্রচলিত—মূলধারার বাংলা মাধ্যম স্কুল, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, আলিয়া ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা ও কওমি ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা। আগে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর পাঠক্রম ও পরিচর্যায় বাংলা চর্চায় ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের সচেতনতা যতটা ছিল, এখন আর তেমনটি নেই। এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলে অধুনা বিলুপ্ত তারকাচিহ্নিত ফলাফল করার প্রবণতা এবং বর্তমানে এ-প্লাস বা স্বর্ণখচিত এ-প্লাস পাওয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা শুদ্ধ বানান ও ভাষায় বাংলা চর্চার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় পাচ্ছেন না। তাই দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মেধাবী ফল করা ছাত্রছাত্রীরা যখন ভুল বানান আর দুর্বল বাক্য গঠনে উত্তরপত্র লেখে, তখন বোঝা যায় সংকটটি কোথায়। আমার মতো মাঝবয়সী অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন, শুদ্ধ বানান আর বাক্যে বাংলা, ইংরেজি লেখাটা স্কুলই শিখিয়ে দিত। এখন এসবের ধার ধারে না কেউ। এক পৃষ্ঠা ইংরেজি লেখায় একটি শব্দের বানানে 'ই'-এর বদলে 'এ' হয়ে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে বাংলা বানান পাঁচটা ভুল করলেও অর্ধেকটা মাত্র চোখে পড়ে শিক্ষকের। বাংলা বানানে ভুল আর বাক্য গঠনে সাধু-চলিত মিশে গেলেও তা গর্হিত অপরাধ নয় জেনে শিক্ষার্থী অবিচল থাকে। এ কারণে বর্তমানে শিক্ষকতায় আসা (স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত) শিক্ষকদের একটি বড় অংশের বাংলা ভাষা আর বানানের দুর্বলতা তাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পল্লবিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিকে লেখা নিবন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতায় বাংলা চর্চার দুর্দশার কথা বলেছিলাম। এমফিল, পিএইচডি করতে আসা কলেজশিক্ষকদের বড় অংশেরই বাংলা ভাষা ও বানান সংশোধন করতে হচ্ছে দিনের পর দিন। অতি সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গত ৩ ফেব্রুয়ারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক—দুই অধ্যাপকের স্বাক্ষরকৃত একটি প্রতিবাদলিপি প্রচারিত হয়েছে। ক্যাম্পাসে ককটেল বিস্ফোরণ নিয়ে প্রতিবাদ। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রায় চার লাইনের এই প্রতিবাদলিপিতে মোট ৯টি ভুল আমার চোখে পড়ে। এর মধ্যে বানানসংক্রান্ত ভুল ছয়টি এবং ফন্ট ভাঙাসংক্রান্ত বিভ্রান্তি তিনটি। দুর্ভাগ্য এসব ভুল-বিভ্রান্তিসহ শত শত কপি প্রতিবাদলিপি বিতরণ হয়েছে। শঙ্কার কথা হচ্ছে, এ নিয়ে কোনো আলোচনা-সমালোচনা কানে আসেনি। এই সামান্য ভুল হয়তো অনেকের চোখে পড়েনি বা 'এ আর এমন কী' বলে সহজেই মেনে নিয়েছে।

ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে দ্রুতই। দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি শেখার তেমন অবকাশ নেই এদের পাঠক্রমে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন এ প্রজন্মের অনেকেই। অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, এই ধারার শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠক্রম বিন্যাসের দুর্বলতার কারণে যতটা ভালো ইংরেজি বলতে পারছে, ততটা ভালো দখল দেখাতে পারছে না ইংরেজি ভাষা ও গ্রামারে। ফলে উন্নতি হচ্ছে না কোনো দিকেই। আমরা মনে করি, বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এ ধারার শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ তৈরি হওয়াটা খুব কঠিন।

আলিয়া ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলা মাধ্যম মূলধারার সঙ্গে অনেকটাই সম্পর্কিত। তাই বাংলা মাধ্যম শিক্ষার অনুরূপ সংকট এ অঞ্চলেও রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় সংকটে আছে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ কওমি মাদ্রাসায় পড়ে। আরবি, ফারসি ও উর্দু কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা-মাধ্যম। বাংলা ও ইংরেজির সঙ্গে এদের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। দেশ, জাতি ও জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অনেকের ধারণাই খুব অস্পষ্ট। আমাদের চারপাশে অর্থবিত্তে আভিজাত্য খোঁজা অনেক পরিবারকেই পাওয়া যাবে, যাদের বাংলা ভালো বলতে না পারা বা লিখতে না পারার মধ্যে এক ধরনের অহমিকার ছোঁয়া থাকে। বেশ কয়েক বছর আগের একটি স্মৃতি মনে পড়ল। এক টেলিভিশন চ্যানেল রাজধানীর কোনো এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের খুদে শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এদের যে কোনো ধারণা নেই, তা ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল। টোয়েন্টি সিক্সের বাংলা কী—অমন প্রশ্নের উত্তরে অসহায় হয়ে পড়ল শিক্ষার্থী।

একটি গোলমেলে অবস্থা বিরাজ করছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা মাধ্যমে পড়ার প্রবণতা বেশি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ভাষা চর্চা গৌণ হয়ে পড়ছে। বাংলা, ইংরেজি কোনো ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির মনোযোগ নেই। এ অবস্থা দিন দিন আরো নাজুক হবে। অসুস্থ রাজনীতির ছোবলে এখন প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই মেধাবী প্রার্থীর চেয়ে শিক্ষক নিয়োগে দলীয় বিবেচনা ও বাণিজ্য বিবেচনা প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান সৃষ্টির কথা থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সে পরিচয় আর তেমনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে থাকছে না।

এ দেশে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক। এগুলোর মধ্যে কিছুসংখ্যক রয়েছে মানসম্মত, কিছুসংখ্যক মধ্যম মানের আর কিছুসংখ্যক দুর্বল মানের। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষায় পড়া বাধ্যতামূলক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত। সাধারণ মানের শিক্ষার্থীদের বড় অংশই ইংরেজি ভাষা—গ্রামারের কাম্য ধারণা নিয়ে আসে না। বিশ্ববিদ্যালয়েও যে ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর তেমন সুযোগ পায় মনে হয় না। এ কারণে পরীক্ষার খাতায় যা রচনা করে তা দেখে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুমান করেই পরীক্ষককে নম্বর দিতে হয়। ভাষা বানানে দৃষ্টি দিলে ফলাফলে মহাবিপর্যয় ঘটবে। নিজে ভাষাচর্চা সবল না হলে যেকোনো ভাষা চর্চায়ই যে সাফল্য পাওয়া যায় না—এ সত্য এখন আর আমাদের বোধে কাজ করছে না। শিক্ষা এক ধরনের বাণিজ্যে পরিণত হয়ে একুশের মূল চেতনা বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে আমাদের।

প্রজন্মকে স্বাজাত্যবোধ থেকে দূরে সরাতে আমাদের টিভি চ্যানেল আর বেসরকারি রেডিও কম কসরত করছে না। তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে তৈরি অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থাপক 'প্রিয় দর্শক'-এর বদলে 'হাই ভিউয়ার্স' বলে হাত-পা ছুড়ে মাঝেমধ্যে অদ্ভুত উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ বলে এক অদ্ভুত খিচুড়ি বানাতে থাকে। বাংলা একাডেমি একটি প্রমিত বাংলা বানানরীতি প্রণয়ন করেছে। আবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তাদের বই লেখার জন্য একটি বানানরীতি ধরিয়ে দেয়। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে লিখতে গিয়ে আরেক বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। প্রমিত বানানরীতির কোনো কোনো বানান সংশোধন করা হয়। এসব অসংগতি দেখলে বোঝা যায় একুশের চেতনা আমাদের চৈতন্যোদয় ঘটাতে পারেনি এখনো। একুশের চেতনা অন্য ভাষাকে বৈরী জ্ঞান করা নয়—নিজ ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মান দেওয়া। আত্মগৌরববোধ ছাড়া প্রজন্ম দেশপ্রেমিক হতে পারে না। নিজ দেশ নিয়ে বড় স্বপ্ন বুনতে পারে না।

বাংলার ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ শোষণের অভিপ্রায় শুরু থেকেই ছিল পাকিস্তানি শাসকদের। পাশাপাশি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত বাঙালির সংগ্রামী চরিত্রের ছবি শঙ্কিত রেখেছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে। তাই শুরুতেই তারা কোনো গভীর পটভূমি রচনার মতো মেধাবী আচরণ না করেই আঘাত হেনেছিল বাংলা ভাষার ওপর। এই ভাষাই যে বাঙালি সংস্কৃতির জীয়নকাঠি এবং রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের পাথেয়, তা স্পষ্ট ছিল পাকিস্তানিদের কাছে। তাই বাঙালিকে সংস্কৃতিশূন্য করার এক স্থূল প্রয়াস চালিয়েছিল তারা। কিন্তু মধ্যযুগের সূচনালগ্ন থেকে যে ভাষা দৃঢ়মূল প্রোথিত, যে ভাষা বাঙালিকে এগিয়ে নিয়েছে, পরিচিত করিয়েছে বিশ্বসভায়—একে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যে কঠিন এই বিবেচনাবোধ পাকিস্তানিদের ছিল না। ফলে প্রচণ্ড বিক্ষোভের অনল ছড়িয়ে পড়েছিল।

বায়ান্নে রক্তমূল্যে ভাষা রক্ষা বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য হলেও এই কার্যকারণসূত্র কিন্তু মোটেও বিস্ময়ের নয়। কারণ প্রায় ৭০০ বছর ধরে যে ভাষা পরিমার্জিত হয়েছে, সে তার ধারক জাতিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আত্মশক্তিতে বলীয়ান করবে, এতে বিস্ময়ের কারণ নেই। সুতরাং ভাষার মর্যাদা রক্ষার চেয়ে পুণ্য কর্ম সে জাতির আর কী হতে পারে?

তবে আশঙ্কার একটি কারণ রয়েছে। একদিকে বাংলা ভাষাচর্চার দুর্বলতা, অন্যদিকে বাজারে চলতি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর প্রজন্মের স্বাজাত্যবোধের জায়গাটি দুর্বল করে দিচ্ছে। বর্তমান বাস্তবতায় অমাদের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে ধরনের ইংরেজি ভাষা-শিক্ষিতগোষ্ঠী তৈরি করছে ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠার পথ তারা হয়তো দ্রুত করে নিতে পারবে; কিন্তু পাশাপাশি বন্দিত্ব বরণ করবে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বলয়ে। এই অপশক্তির ধারণা, এমনি করে বাঙালি সমাজের ঐক্য খণ্ডিত হয়ে যাবে। এই ভাঙনের ভেতর থেকে অশুভ শক্তি একটি তাঁবেদারগোষ্ঠীর জন্ম দিতে চায়, যাদের সমর্থনে এরা এক অদৃশ্য প্রভুত্বের আসন পাকা করবে।

ইতিহাস অবশ্য অন্য শিক্ষা দেয়। যে বাংলা ভাষার মূল শক্ত মাটিতে প্রোথিত, অশুভ ঝোড়ো বাতাসে তার উৎপাটন সম্ভব নয়। বড়জোর ডালপালা ভাঙতে পারে। সচেতন বাঙালির সতর্ক পরিচর্যার জল সিঞ্চনে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াবে ভাষার গাছ। সংস্কৃতির ডালপালা গজাবে নতুন তেজে। অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী হবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। বাংলাদেশের সামাজিক, সংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি ঈর্ষণীয় জায়গায় এসে পৌঁছাতে পারে। তবে তার জন্য প্রয়োজন সতর্কতা। প্রয়োজন বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যকে প্রজন্মের কাছে উন্মোচন করা।

লেখক : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়